Copula: Jahangirnagar University Studies in Philosophy, Vol. XXXV, June 2018

ধর্মীয় ভাষার ভিটগেনস্টাইনীয় বিশ্লেষণ

মোঃ সাহিদুল ইসলাম*

[**সার-সংক্ষেপ:** ধর্ম বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভয়ানকভাবে বিভাজিত একটি দেশে বিজ্ঞানশিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রগতিবাদী মানুষজন ধর্মকে কী দৃষ্টিতে দেখছেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মকে কী দৃষ্টিতে দেখা হবে বা ধর্মের প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হবে তা নির্ভর করে ধর্ম কী, ধর্মবিশ্বাসগুলো কুসংস্কার নাকি অন্যকিছু, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কী এসব প্রশ্নের কোন উত্তর আমরা ঠিক বলে ধরে নিচ্ছি তার উপর। লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় ভাষার দার্শনিক বিশ্লেষণ ধর্মের প্রকৃতি বিষয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ আলো ফেলতে পারে। আমার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তাই ধর্মীয় ভাষা (religious language)। ধর্মবিশ্বাসপ্রকাশকারী বাক্যসমূহকে বিবরণমূলক (descriptive) মনে করার যে প্রভাবশালী চর্চা আমাদের সমাজে চালু আছে আমার আলোচনায় আমি তাকে যাচাই করে দেখার চেষ্টা করবো। ধর্মীয় ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের কিছু মন্তব্যের সূত্র ধরে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো- ধর্মবিশ্বাস যে উক্তিগুলোতে প্রকাশিত হয় সেসব উক্তিকে আমাদের সাধারণ (ordinary) বিশ্বাস বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস প্রকাশকারী উক্তির সাথে সমশ্রেণীভুক্ত না করার জোরালো কারণ রয়েছে। ধর্মবিশ্বাস প্রকাশকারী কিছু উক্তির উদাহরণ হচ্ছে - "ঈশ্বর আছেন", "ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন" ইত্যাদি। আমাদের সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসসমূহের ভাষিক প্রকাশ বাহ্যত ধর্মবিশ্বাসের ভাষিক প্রকাশের মতোই, যেমন- "সুন্দরবনে বাঘ আছে", "রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ তৈরি করেন" ইত্যাদি। ধর্মীয় উক্তিসমূহের সাথে সাধারণ বিবরণমূলক উক্তি বা বৈজ্ঞানিক উক্তিসমূহের বাহ্যিক সাদৃশ্য যে বিভ্রান্তি তৈরি করে তার ফলে ধর্মীয় উক্তিগুলো সত্য নাকি মিথ্যা, এগুলোর প্রমাণ কী ইত্যাদি প্রশ্ন উদ্ভূত হয়। অথচ বাহ্যিক এই সাদৃশ্য দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে আমরা যদি ধর্মীয় উক্তিগুলো কারা কোন পরিস্থিতে ব্যবহার করেন এবং ধর্মবিশ্বাসগুলো ধার্মিকের জীবনে কী ভূমিকা পালন করে তার দিকে মনোযোগী হই তাহলে ধর্মীয় উক্তিগুলোকে আর অতো সহজে বিবরণমূলক উক্তির শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ফলে "ধর্ম কী" বা "ধর্মবিশ্বাসগুলো কী" এর উত্তরে যদি কেউ বলেন "ধর্মবিশ্বাসগুলো একগাদা কুসংস্কার বা ভুল (মিথ্যা) বিশ্বাসমাত্র" তাহলে এর যথার্থতা

* **মোঃ সাহিদুল ইসলাম:** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়ে সন্দেহের জোরালো কারণ পাওয়া যায়। ধর্মীয় ভাষার দার্শনিক বিশ্লেষণ আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যায় যে, যে-অর্থে সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলোকে *সত্য* বা *মিথ্যা* বলা যায় *সে-অর্থে* ধর্মবিশ্বাসগুলো *সত্য* বা *মিথ্যা* কোনোটিই নয় (এখানে "*সে-অর্থে*" পদটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়)। ফলে বিশ্বাসী যখন দাবি করেন "ঈশ্বর আছেন" তখন তা সত্য হতে বাধা নেই কারণ "সত্য" শব্দের যে-অর্থে "সুন্দরবনে বাঘ আছে" সত্য বলে দাবি করা হয় *সে-অর্থে* তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব দাবি করছেন না। একইভাবে অবিশ্বাসী যখন "ঈশ্বর আছেন " ধার্মিকের এ দাবিকে মিথ্যা গণ্য করেন তখন তিনি গুরুতর ভুল করেন বলা যেতে পারে যেহেতু "জাহাঙ্গীরনগরে বাঘ আছে" উক্তিটি যে-অর্থে মিথ্যা *সে-অর্থে* "ঈশ্বর আছেন" মিথ্যা নয়। কোনো সাহিত্যগ্রন্থ বা কাব্য থেকে কোনো উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে এর সত্যতা বা প্রমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেমন অবান্তর একইভাবে ধর্মীয় কোনো উক্তিকে ধার্মিকের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এগুলোর প্রমাণের দাবিও অবান্তর। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ধর্মীয় উক্তিগুলো স্রেফ শিল্প-সাহিত্যের উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দাবি কেবল এটুকু যে, শিল্প-সাহিত্যে ব্যবহৃত উক্তিগুলো যেমন বিবরণমূলক উক্তি থেকে আলাদা ধর্মীয় উক্তিগুলোও তা-ই। ধর্মীয় ভাষা বিবরণমূলক নয় এ দাবি ধর্মের মরমী (mystic) সংস্করণগুলোর (উদাহরণ- সুফিগণ বা রামকৃষ্ণের ধর্ম) জন্যে যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য সাধারণ লোকের ধর্মের জন্যেও। ফলে কেউ যদি ভুতে বিশ্বাস করে তাহলে তাকে বিভ্রান্ত গণ্য করা ও তার প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করার কিছু যৌক্তিকতা থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস করার জন্যে ধার্মিককে অবজ্ঞা করার কিছু থাকে না। ধর্মীয় ভাষার প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা সঠিক হলে সাধারণ লোকেদের ধর্মের প্রতি যে প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা সমাজে ধর্মকেন্দ্রিক বিভাজনকে (বিশ্বাসী বনাম অবিশ্বাসী) জিইয়ে রাখে তার ভিত্তিমূলই নড়বড়ে হয়ে যায়।]

সম্প্রতি বাংলাদেশে ব্লগার হত্যার ঘটনাগুলোর পর সাধারণ মুসলমান ও প্রগতিবাদীদের প্রতিক্রিয়ার ধরন এবং এ জাতীয় আরো নানা ঘটনা থেকে টের পাওয়া যায়, দেশে ধর্মকেন্দ্রিক বড় একটি বিভাজন আছে। এ বিভাজনের একটা পক্ষ ধর্মবিশ্বাসীগণ অন্যপক্ষ ধর্মঅবিশ্বাসীগণ[১]। ব্লগার যাঁরা ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করে লিখেছেন ও ধার্মিকের প্রতি নিজেদের অবজ্ঞা অকপটে প্রকাশ করেছেন তাঁদের কাজ ভাসমান অতিকায় তুষারখণ্ডের দৃশ্যমান শীর্ষমাত্র। অনুমান করা যায়

১. এটা একটা মোটা দাগের শ্রেণীকরণ। হয়তো মাঝামাঝি আরেকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা ধর্মের প্রকৃতি ও মূল্য বিষয়ে অনিশ্চিত, দ্বিধাগ্রস্ত ও সিদ্ধান্তহীন।

- গুটিকয় ব্লগার ছাড়াও আমাদের সমাজে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন ধর্মবিশ্বাসগুলো একগাদা ভুল (মিথ্যা) বিশ্বাসমাত্র যেগুলো জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে একসময় দূর হয়ে যাবে। সমাজের শিক্ষিত, প্রগতিশীল, কল্যাণকামী, অগ্রসর চিন্তার মানুষদের একটা বড় অংশের কল্পনায় যে আদর্শ সমাজ আছে তাতে ধর্ম বা ধার্মিকের কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ ওই সমাজের মানুষেরা সবাই সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞানমনস্ক ফলে সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত এবং সেই সাথে ধর্মের কবল থেকেও মুক্ত। অবিশ্বাসী যদি মনে করেন বিশ্বাসীর বিশ্বাসগুলো সবই ভুল বা মিথ্যা তাহলে এর একটা স্বাভাবিক পরিণতি দাঁড়ায় বিশ্বাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার মনোভাব। এই মনোভাব হয়তো ব্লগারদের লেখায় প্রকট বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে উৎকটভাবে এসেছে কিন্তু আরো মানুষ আছেন যাঁদের মধ্যে একই মনোভাব আছে প্রচ্ছন্নভাবে। সমাজে যদি এই অবজ্ঞার মনোভাবের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব না থাকতো তাহলে এ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন হতো না। কিন্তু দেশের শিক্ষিত, বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রসর অংশটি, বিশেষত ইতিহাস-সমাজ-রাজনীতি সচেতন নাগরিকদের বড় অংশটি যদি সাধারণ লোকের রাজনীতি গড়ে তুলতে চায় অথচ একইসাথে ওই লোকেদের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করে তাহলে তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনা কম হবার কথা। অবজ্ঞা যতো প্রচ্ছন্নই হোক তাকে পুরোপুরি লুকোনো সম্ভব নয়। ধার্মিক কি অবিশ্বাসীর অবজ্ঞার আঁচ অনুভব সত্ত্বেও তার ডাকে সাড়া দিয়ে নতুন সমাজ গড়ার কাজে নামতে পারবেন? যে-অবিশ্বাসী নতুন সমাজ গড়তে চান তিনি কি তাহলে কেবল আমজনতাকে সাথে পাবার জন্যেই আমজনতার মতো ধার্মিকে পরিণত হবেন? কিন্তু তা কী করে সম্ভব? অবিশ্বাসী তো নিজের মনে নিজে ভালো করেই জানেন যে ধর্মবিশ্বাসগুলো সব ভুল। তাহলে কী করে তিনি ধার্মিক হবেন? তাহলে কি তিনি আত্মপ্রতারণা করবেন, ধার্মিক হবার ভান করবেন? সেটাও কোনো ভালো সমাধান নয়, আর ভান দিয়ে বেশিদূর এগোনোও যায় না। এই সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসী সাধারণত যা করেন তা হচ্ছে উদারবাদী হওয়া, বিশ্বাসীকে "সহ্য করা", "মেনে নেয়া"। এই মেনে নেয়াকে তিনি হয়তো যুক্তিযুক্ত করেন এই ভেবে যে, যে কারো যে কোনো কিছু বিশ্বাস করার স্বাধীনতা আছে। তবে মনে মনে তিনি ঠিকই ধরে নেন যে, ধার্মিক বাস করছে এক বিভ্রান্তির মধ্যে। অনেক অবিশ্বাসীই হয়তো এজন্যে উচ্চমন্যতায় ভোগেন। কেউ কেউ বিশ্বাসীকে "বিশ্বাসের ভাইরাস" থেকে মুক্ত করার মহান দায় বোধ থেকে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে ধর্মবিশ্বাসসমূহের

অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণে ব্যস্ত হন। এটা বিশ্বাসীদের মধ্যে বিপন্নতার বোধ তৈরি করে; তাঁদের ক্ষুদ্র একটি অংশ আবার আগ্রাসী হয়ে ওঠে। বিশ্বাসীর বিপন্নতার বোধ, তাঁর আহত ধর্মানুভূতি অবিশ্বাসীর চোখে হাস্যকর দুর্বলতা। আহত ধর্মানুভূতির সাথে আহত কাব্যানুভূতি, সংগীতানুভূতি, শিল্পানুভূতি বা সৌন্দর্যানুভূতির কোনো গুণগত তফাৎ তিনি খুঁজে পান না। বিপন্ন বোধ করা বিশ্বাসীদের বড় অংশ নিজেরা আগ্রাসী না হলেও নিজেদের নীরবতা ও প্রতিবাদহীনতার মাধ্যমে আগ্রাসী অংশটিকে সচেতন কিংবা অসচেনভাবে নৈতিক সমর্থন ও শক্তি যোগান।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে: ধার্মিককে অবজ্ঞা বা সহ্য করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প কি নেই? এমন কি হতে পারে যে, ধর্ম অবজ্ঞার যোগ্য তো নয়ই বরং বেশ কৌতুহলোদ্দীপক, এমনকি শ্রদ্ধাযোগ্য একটা প্রপঞ্চ (phenomenon)? কোনো স্বাধীন, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কি ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধাযোগ্য প্রমাণ করতে সক্ষম? ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধাযোগ্য প্রমাণ করতেই হবে এমন চিন্তা বা চাপ মাথায় নিয়ে রাখলে স্বাধীন, নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কঠিন হয়ে পড়বে। তবে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞার মূলে আছে ধর্ম যা নয় তাকে তা ভাবার মধ্যে। একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ অনুসন্ধানও ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসীর অবজ্ঞার ভিত্তিহীনতা দেখাতে সক্ষম যা হয়তো বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীকে বিভেদ ভুলে একই পাটাতনে এসে দেশ গড়া কিংবা নতুন সমাজ তৈরির মতো সত্যিকার জরুরী কাজে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে নামতে সাহায্য করবে। এমনই একটি অনুসন্ধান-প্রয়াসের ফল উপস্থাপন বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এখানে বলে নেয়া উচিত, আমাদের অনুসন্ধানটি একটি কনসেপচুয়াল (conceptual) বা ধারণামূলক অনুসন্ধান। মানবীয় বুদ্ধির একটা জোরালো প্রবণতা হচ্ছে, কিছু সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সমজাতীয় কতগুলো জিনিসকে অভিন্ন কোনো ধারণা, ক্যাটেগরি বা শ্রেণীর অধীনস্থ করা। এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্যাটেগরাইজেশন বা শ্রেণীকরণগুলো সবসময় যে সঠিক হয় তা নয়। দর্শনের একটি প্রধান কাজ শ্রেণীকরণের এসব ত্রুটিগুলো স্পষ্ট করে দেখানো এবং তার মাধ্যমে ধারণাসমূহের পুনর্বিন্যাস (কিংবা বলা যায়, জট-পাকিয়ে-যাওয়া চিন্তার জট খোলার পথ বের করা)। ধর্মীয় ভাষাকে যে ধারণা বা ক্যাটেগরির অধীনে অনেকেই দেখতে অভ্যস্ত বর্তমান প্রবন্ধে তার পর্যালোচনা করে ধর্মীয় ভাষাকে ভিন্নভাবে কনসেপচুয়ালাইজ করা বা ক্যাটেগরাইজ/ শ্রেনীকরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই ধর্মীয় ভাষার অর্থ এবং ভাষার অন্যান্য এলাকার সাথে এর পার্থক্য ও সম্পর্ক কী সেটাই বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রীয় জায়গা।

ধর্মীয় ভাষার এই বিশ্লেষণ আমরা করছি দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের (Ludwig Wittgenstein) দৃষ্টিকোণ থেকে[২]। প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্ভর করছি ধর্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে তাঁর লেকচার থেকে তাঁর শিক্ষার্থীদের নেয়া নোটের সংকলন *লেকচার্স অন রিলিজিয়াস বিলিফস*, *কালচার এন্ড ভ্যালু* নামে প্রকাশিত তাঁর নোটবইয়ের কিছু মন্তব্য, তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি *ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩)*, এবং জীবনের শেষ কয়েক বছরে লেখা তাঁর কিছু মন্তব্যের সংকলন *অন সার্টেনটি*-র উপর। ভিটগেনস্টাইনের রচনা প্রথাগত দর্শন নয়, তাই এতে যুক্তির পর যুক্তি গেঁথে সাজানো কোনো তত্ত্ব বা সুস্পষ্ট কোনো প্রতিপাদ্য (থিসিস) পাওয়া যাবে না। দুর্বোধ্যতার জন্যে খ্যাত এবং আপাতদৃষ্টে বিচ্ছিন্ন (অথচ গভীর ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ) ভিটগেনস্টাইনের নানা মন্তব্যের মধ্যে ধর্মীয় ভাষাকে যেভাবে দেখা হয়েছে তা আমাদের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়াতে বর্তমান রচনায় তা খোলাসা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিবরণমূলক উক্তি

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, আমাদের চিন্তাজগতের অনেক গোলমালের গোড়া রয়েছে ভাষার মধ্যে। তাই ধর্মবিশ্বাস নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি আছে কিনা তার মূল খুঁজতে ধর্মবিশ্বাস ও অন্যান্য সাধারণ বিশ্বাস (ordinary beliefs) প্রকাশকারী ভাষার দিকে নজর দেয়া দরকার। "শব্দ", "বাক্য" ইত্যাদি ভাষিক উপাদানগুলোকে একরকম হাতিয়ার বা টুলস হিসেবে দেখা যেতে পারে। শব্দ বা

---

২. আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ধর্মের প্রকৃতি ও মূল্য বিষয়ে পাবলিক আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। হুমায়ুন আজাদের *আমার অবিশ্বাস* রাসেলের *হোয়াই আই অ্যাম নট এ ক্রিশ্চিয়ান* (*Why I am not a Christian)* দ্বারা অনুপ্রাণিত; বইটি উৎসর্গও করা হয়েছে রাসেলকে। দুঃখের বিষয় দর্শন এগিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশে ধর্ম বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা বহুলাংশে এখনো রাসেলীয় বৃত্তে বন্দী (যদিও ধর্মদর্শনে রাসেলের মৌলিক অবদান সামান্যই)। লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন, যিনি বিংশ শতাব্দীর গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকদের একজন এবং কারো কারো মতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী, ছিলেন রাসেলের সরাসরি ছাত্র, যাঁর চিন্তা দ্বারা রাসেল নিজেও প্রভাবিত হয়েছেন এবং যাঁর বিশ্ময়কর প্রতিভা দর্শনে বিরাট অগ্রগতি সাধন করবে বলে রাসেল মনে করেছেন। ধর্ম বিষয়ে ভিটগেনস্টাইনের যে মন্তব্যসমূহ পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে ব্যাপক আলোচনা ও চর্চা চলছে। অথচ, দুঃখজনকভাবে, আমাদের দেশে ধর্ম বিষয়ক আলোচনায় ভিটগেনস্টাইন একেবারেই অনুপস্থিত।

বাক্য মাত্রই কোনো না কোনো ভাষার অংশ। আর "একটি ভাষাকে কল্পনা করা মানে হচ্ছে একটি জীবনধারাকে (form of life) কল্পনা করা" (ভিটগেনস্টাইন, ইনভেস্টিগেশনস ১৯)। একটি ভাষা আছে মানে ঐ ভাষা ব্যবহারকারী একটি জনগোষ্ঠী আছে যাঁরা ভাষাটির শব্দ, বাক্যসমূহকে নানা উদ্দেশ্যে নানা কর্মকাণ্ডে ব্যবহার (use) করেন। ভাষার সরঞ্জামাদি অসীম নয়। এর সীমিত সরঞ্জামাদি দিয়ে আমরা বহু কর্ম সম্পন্ন করি। ভাষার অসংখ্য ব্যবহারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিবরণমূলক (descriptive), আবেগমূলক (expressive), নির্দেশনামূলক (directive) ইত্যাদি ব্যবহার। কোনো একটি ভাষার কোনো বিশেষ বাক্যের জন্যে বিশেষ কোনো ব্যবহার অনিবার্যভাবে নির্ধারিত থাকে না। একটি বাক্যের অর্থ বিবরণমূলক কিনা তা নির্ভর করছে ঐ বাক্যটি যে পরিস্থিতিতে যিনি ব্যবহার করছেন তিনি বিবরণমূলকভাবে ব্যবহার করছেন কিনা তার উপর। ধরা যাক, আমার এক বন্ধু জানেন যে, বহু বছর ধরে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের অবনতি হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে সেখানে বাঘের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। তিনি সন্দিহান হয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন সুন্দরবনে এখন আদৌ বাঘের কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা। আমি তাকে উত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করলাম: (ব১)"সুন্দরবনে বাঘ আছে।" আমার উত্তরে আমি তাকে সুন্দরবনে বাঘের অস্তিত্ব সংক্রান্ত একটি পরিস্থিতির বিবরণ দিলাম বা একটি তথ্য জানালাম। "সুন্দরবনে বাঘ আছে" বাক্যটিকে আমি বিবরণমূলকভাবে ব্যবহার করলাম। বাক্যের বিবরণমূলক ব্যবহার আমরা হরহামেশাই করি তাই এই ব্যবহার আমাদের খুব চেনা। নিচে আরেকটি বাক্যের উদাহরণ দিচ্ছি যেটি মূলত বিবরণমূলকভাবে ব্যবহার করা হয় বা যেটির বিবরণমূলক ব্যবহার খুব সহজেই কল্পনা করা যায়:

(ব২) রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ তৈরি করেন

ব১ ও ব২ বাক্যদ্বয়ের মতো অসংখ্য বাক্য আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক বাক্যগুলোকেও বিবরণমূলক বাক্যের শ্রেণীতে ফেলা যায়। নিউটনের তৃতীয় সূত্র "প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে" বিবরণমূলক বাক্যের আরেকটি উদাহরণ। কোনো বাক্য বা উক্তি কোনো পরিস্থিতিতে বিবরণমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা বোঝার একটি পথ হচ্ছে বাক্যের ব্যবহারকারী বাক্যটিকে মিথ্যা প্রমাণের উপায় কল্পনা করতে পারছেন কিনা তা দেখা। বন্ধুকে বলা আমার উক্তি "সুন্দরবনে বাঘ আছে" কখন মিথ্যা প্রমাণিত হয় আমি তা কল্পনা করতে পারি। অর্থাৎ কী ধরনের প্রমাণ পেলে আমি বিশ্বাস করবো যে ব১ উক্তিটি মিথ্যা আমি তা নির্ধারণ করতে সক্ষম।

উদাহরণস্বরূপ, ক্যামেরায় ছবি তোলা, খালে বাঘের পায়ের ছাপ গোনা ও তার গতিবিধি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে বন বিভাগের একটি জরিপ যদি দাবি করে যে সুন্দরবনে কোনো বাঘ আর অবশিষ্ট নেই আমি হয়তো একে একটি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ গণ্য করবো। একইভাবে ব২ উক্তিটিও এমন উক্তি যা সাধারণ পরিস্থিতিতে বিবরণমূলকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় "কী ধরনের প্রমাণ দেয়া হলে আপনি বিশ্বাস করবেন যে, রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ তৈরি করেন নি?" আমি হয়তো বলবো "যদি কোনো বিজ্ঞানের ইতিহাসের লেখক যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটা কোনো গবেষণা পত্রিকায় দাবি করেন আর একই বিষয়ের অন্যান্য গবেষকরা তা মেনে নেন"। মিথ্যায়নের উপায় আরো সহজে কল্পনা করা যায় নিচের উক্তির ক্ষেত্রে: "জা.বি.-র দর্শন বিভাগের ১১৭ নং কক্ষে এখন একটা ক্লাস শুরু হয়েছে"। ১১৭ নং কক্ষের কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারি উক্তিটি মিথ্যা কিনা।

ধর্মীয় উক্তি ও বিবরণমূলক উক্তির তুলনা

এবার কয়েকটি ধর্মীয় উক্তির দিকে মনোযোগ দেয়া যাক:

(ধ১) ঈশ্বর আছেন

(ধ২) ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন

ধার্মিককে যদি বলা হয় "আপনি কি এমন কোনো পদ্ধতি বা উপায় কল্পনা করতে পারবেন যা ধ১-কে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারে অর্থাৎ প্রমাণ করতে পারে যে, ঈশ্বর নেই?", তখন তিনি কী উত্তর দেবেন? সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই অনুমেয়, ধার্মিক এমন কোনো প্রমাণের পদ্ধতি বা উপায় কল্পনা করতে পারবেন না। এর সাথে আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, ধার্মিকের জন্যে এমনকি ধ১ বা ধ২ উক্তিগুলোকে *সত্য প্রমাণ করতে পারে* এমন কোনো উক্তিও থাকা সম্ভব নয়, যদিও ব১ বা ব২ এর মতো উক্তিগুলোকে প্রমাণ করতে পারার মতো উক্তি ধার্মিক সহজেই খুঁজে পাবেন। প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমেয়কে যিনি মেনে নিতে চাইবেন তাঁর কাছে নিশ্চয়ই প্রমাণকে (proof) প্রমেয় (to be proved) থেকে অধিকতর নিশ্চয়তাযুক্ত হতে হবে। যে উক্তিকে প্রমাণ করবো তা যদি যার ভিত্তিতে প্রমাণ করবো তার থেকে বেশি নিশ্চয়তাযুক্ত হয় তাহলে প্রমাণটির আর প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। প্রমাণের কাজ হচ্ছে প্রমেয়র সাথে যেটুকু সংশয় জড়িত আছে তা দূর করতে ভিত্তির যোগান দেয়া। এজন্যে প্রমাণকে হতে হয় প্রমেয়র চেয়ে বেশি নিশ্চয়তাসম্পন্ন। কিন্তু ধ১ বা ধ২ এর মতো ধর্মবিশ্বাসগুলোতে সংশয়

বা অনিশ্চয়তার কোনো লেশ থাকে না। ধার্মিকের কাছে এমন আর কোনো উক্তি নেই যার সম্পর্কে তিনি এমন মাত্রায় নিশ্চিত যা ধ১ ও ধ২ এর নিশ্চয়তার চেয়েও বেশি। তাই ধার্মিকের কাছে ধ১ বা ধ২ এর জন্যে কোনো প্রমাণ নেই, থাকতে পারে না।[৩]

প্রশ্ন উঠতে পারে, ধর্মের কথাগুলোর মিথ্যায়নের পদ্ধতি কল্পনা করতে না পারা কিংবা সত্যায়নের জন্যে প্রমাণ খুঁজে না পাওয়া থেকেই কি স্পষ্ট হয়ে যায় না যে, ধর্মের কথাগুলো সব আসলে মিথ্যা ও অযৌক্তিক? এখানে লক্ষণীয় যে, "মিথ্যা", "সত্য", "যৌক্তিক", "অযৌক্তিক" ইত্যাদি পদগুলো বিবরণমূলক বাক্যসমূহের উপর প্রয়োগের সময় আমরা (ভিটগেনস্টাইনের ভাষায়) যে ভাষা-ক্রীড়ায় (language-game) রত হই তা ধর্মীয় ভাষা-ক্রীড়া থেকে একেবারেই আলাদা। অন্যভাবে বললে, এই পদগুলো বিবরণমূলক বাক্যের উপর আমরা যে-অর্থে প্রয়োগ করি সে-অর্থে এরা ধর্মীয় উক্তিসমূহে প্রযোজ্য নয়। তার মানে কিন্তু এ নয় যে, ধর্মীয় উক্তিগুলোকে ধার্মিক সত্য বলে গণ্য করতে পারবেন না। অবশ্যই পারবেন। শুধু খেয়াল করার বিষয় হচ্ছে, ধার্মিক যে-অর্থে ধমীর্য় উক্তিকে সত্য বলে গণ্য করেন সে-অর্থে বিবরণমূলক উক্তিসমূহের ক্ষেত্রে "সত্য" কথাটা তিনি ব্যবহার করেন না[৪]। ধর্মীয় উক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য এতক্ষণ আমরা দাবি করলাম তার গ্রহণযোগ্যতা আরো স্পষ্ট হবে যদি আমরা এমন কিছু উক্তি খুঁজে পাই যেগুলো ধর্মীয় উক্তি নয় অথচ যেগুলোতে ওইসব বৈশিষ্টের উপস্থিতি সহজেই শনাক্ত করা যায়।

নিশ্চয়তাসমূহ ও ধর্মীয় উক্তির সাদৃশ্য

(ন১) "জগত আছে" (The world exists) এ উক্তিটি বিবেচনা করা যাক। এটি কি সত্য? জগত নেই বা আমাদের চেনা জগতের সবটাই কল্পনা মাত্র এটা প্রমাণের কোনো উপায় আমরা কল্পনা করতে পারি না। কী ধরনের প্রমাণ পেলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে জগত নেই তা চিন্তায় আনতে আমরা অক্ষম।

৩. অবশ্য ধার্মিককে ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে প্রমাণ খুঁজতে বাধ্য করা হলে তিনি হয়তো কখনো কখনো কিছু প্রমাণের উল্লেখ করেন। তবে তার মানে এই নয় যে, এসব প্রমাণের জন্যেই তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসগুলো পোষণ করেন। ধার্মিকের কাছে প্রমাণের স্থান বিশ্বাসের পরে, আগে নয়। অবশ্য এটা ধার্মিকের কোনো দোষ বা দুর্বলতা নয়। এ বিষয়ে পরে আমরা আরো বিস্তারিত বলবো।

৪. কিংবা হয়তো ধর্ম বিষয়ক কুতর্কে জড়ানোর দরকার না হলে "সত্য" শব্দটাই টেনে আনার প্রয়োজন ধার্মিকের হয় না।

এমন কোনো উক্তি কি আছে যার সত্যতা বিষয়ে আমরা এতো বেশি নিশ্চিত যা ন১ উক্তির জন্যে আমাদের নিশ্চয়তার চেয়েও বেশি? এরকম উক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। জগত যে আছে এর চেয়ে বেশি নিশ্চিত অন্য আর কিছুতে আমরা বোধ করি না। জগত সত্যিই আছে কিনা এ নিয়ে কেউ সংশয়ে ভুগলে সেটা কোনো প্রশংসনীয় অনুসন্ধানের সূচনা হিসেবে নয় বরং এক রকম মনোবিকলনের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হতে পারে। তার মানে, "জগত আছে" উক্তিটি "সত্য", "মিথ্যা", "যৌক্তিক", "অযৌক্তিক" কোনোটিই নয়। ভিটগেস্টাইন এ জাতীয় উক্তির নাম দিয়েছেন নিশ্চয়তা (certainty)। এরকম আরেকটি নিশ্চয়তার উদাহরণ হচ্ছে (ন২)"আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে" উক্তিটি। আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা না থাকার কোনো প্রমাণ আমরা চিন্তা করতে পারি না। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের প্রতিটি কাজ আমরা এমনভাবে করি যেন স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা কাজটি করছি, অর্থাৎ যেন কাজটি করা ও না-করার দুটি বিকল্প আমাদের সামনে খোলা ছিল এবং আমরা স্বাধীনভাবে একটিকে বেছে নিয়েছি। আমাদের ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা বিষয়ে আমরা এতোটাই নিঃসংশয় যে, এমন কোনো উক্তি আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় যা ন২ উক্তিটির যৌক্তিক ভিত্তি যোগাতে পারে। কেউ হয়তো মুখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণবাদী (determinist) দাবি করতে পারেন আর বলতে পারেন যে, তার নিজেরসহ দুনিয়ার সব মানুষের সব কাজই পূর্ববর্তী কারণ দ্বারা পুরোপুরি নির্ধারিত হয় এবং স্বাধীন ইচ্ছা এক রকম বিভ্রম (illusion) মাত্র। কিন্তু এই মৌখিক দাবি নিরর্থক কারণ এই দাবিটি করার সময়ও তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্বে তাঁর নিজের বিশ্বাস তাঁর আচরণে প্রকাশ না করে পারেন না। অর্থাৎ সবিরোধিতা তৈরি করা ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকারের আর কোনো পথ নেই। এমনকি আমি যখন প্রশ্ন করি "আমার কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে" তখন প্রশ্ন করার কর্মটি সম্পাদনের সময় আমি আমার স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব আমার আচরণে প্রদর্শন করি (show)। অর্থাৎ আমি প্রদর্শন করি যে, আমার প্রশ্নটি আমি নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে করেছি, প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার স্বাধীনতা আমার আছে ইত্যাদি। ন১ বা ন২ -জাতীয় উক্তিগুলোর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো আমাদের সমস্ত কর্মে, আচরণে, জীবন-যাপনে পরিব্যপ্ত থাকে। ফলে কেউ যদি মুখে মুখে এসব উক্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করেন তা কোনো প্রকৃত সংশয় (genuine doubt) হবে না কারণ এই সংশয়ক্রিয়া নিজেই এসব উক্তির সত্যতা, বলা যেতে পারে, একরকম পূর্বানুমান (presuppose) করে নেয় অর্থাৎ স্ববিরোধিতা তৈরি করে।

ধার্মিকের জীবনে ধর্মের কথাগুলোর স্থান একজন যে কোনো স্বাভাবিক মানুষের জীবনে ন১ বা ন২ জাতীয় উক্তিগুলোর স্থানের মতো। ধার্মিকের চিন্তা ও কথা যে পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং যে উৎস থেকে অর্থ পায় তার মধ্যে আছে তাঁর ওই ধর্মবিশ্বাসগুলো। ধার্মিকের কর্মে, আচরণে, জীবনযাপনে ধর্মবিশ্বাসগুলো পরিব্যাপ্ত থাকে। ধার্মিকের বেঁচে থাকার ধরনের সাথে ধর্মবিশ্বাসগুলো অচ্ছেদ্য। ধর্মের সমালোচনাকারীরা ধরে নেন, ধর্মবিশ্বাসগুলো ধর্মজীবনের ভিত্তি। *আমার অবিশ্বাস* এ হুমায়ুন আজাদ বলছেন "বিশ্বাসীদের সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর, তবে ওই ভিত্তিটা দাঁড়ানো শূণ্যতার ওপর।" (আজাদ, ১৯৯৭, পৃ. ৩০) ভিটগেনস্টাইন উল্টো এক সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধার্মিকের ধর্মকর্ম তার বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত হয় না, বরং ধর্মবিশ্বাসগুলো হচ্ছে ধর্মজীবনের অঙ্গের মতো। অন্যভাবে বললে, ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মীয় উক্তিগুলো ধর্মীয় আচার ও কর্মকাণ্ডের যেন ঘনীভূত রূপ। ব্যক্তির মধ্যে ধর্মবিশ্বাস আছে বলে তিনি ধর্মীয় আচার পালন করেন ব্যাপারটা এমন নয়; বরং ধর্মবিশ্বাসগুলো নিজেই যেন একরকম ধর্মীয় আচার। হুমায়ুন আজাদ তাঁর পূর্বোক্ত উক্তিটিতে বিশ্বাসের শূণ্যতার ভিত্তির কথা বলে ধর্মবিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তির অনুপস্থিতি বুঝিয়েছেন। কিন্তু ন১ ও ন২ উক্তি দুটোর বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি যৌক্তিক ভিত্তির অনুপস্থিতি সবসময় দোষের নয়। ন১ ও ন২ উক্তিদ্বয়ের মতোই ধর্মের কথাগুলো যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার সীমানার বাইরের বিষয়। এগুলোকে যাঁরা সত্য-মিথ্যার সাধারণ অর্থে "মিথ্যা" বলে রায় দেন তাঁরা এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে, "মিথ্যা"-র ওই অর্থে ধর্মবিশ্বাসগুলো মিথ্যা হতে পারে না। আর "সত্য" বিধেয়র যে-অর্থে যে কোনো সাধারণ মানুষের জন্যে ন১ বা ন২ সত্য, সে-অর্থে ধার্মিকের জন্যে ধ১ ও ধ২ সত্য। অন্যভাবে বললে, বিশ্বাসী যখন দাবি করেন "ঈশ্বর আছেন" তখন তা সত্য হতে বাধা নেই কারণ "সত্য" শব্দের যে-অর্থে "সুন্দরবনে বাঘ আছে" সত্য বলে দাবি করা হয় সে-অর্থে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবি করছেন না। একইভাবে, অবিশ্বাসী যখন "ঈশ্বর আছেন" ধার্মিকের এ দাবিকে মিথ্যা গণ্য করেন তখন তিনি গুরুতর ভুল করেন বলা যেতে পারে যেহেতু "মিথ্যা" শব্দের যে-অর্থে "জাহাঙ্গীরনগরে বাঘ আছে" উক্তিটি মিথ্যা সে-অর্থে "ঈশ্বর আছেন" মিথ্যা নয়।

"ঈশ্বর" শব্দটি প্রয়োগে ভিন্নতা

"ঈশ্বর" শব্দটি ধার্মিক যেভাবে ব্যবহার করেন তা যে তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য আপাত সদৃশ শব্দের ব্যবহার থেকে গুণগতভাবে পৃথক তা আরেকভাবে দেখানো সম্ভব। কল্পনা করা যাক, এক ছিঁচকে চোর রাস্তার ধারের একটি বাল্ব চুরির মতলব করেছে। বাল্বের দিকে এগিয়ে যাবার পর চোরটি লক্ষ্য করল, কাছেই একজন পুলিশ দণ্ডায়মান। চোরটি জানে যে, বাল্বের কাছেই পুলিশ আছেন, বাল্ব চুরি করতে গেলে পুলিশ তাকে দেখবেন এবং শাস্তি দেবেন। এক্ষেত্রে পুলিশের চোখে ধরা পড়া এবং শাস্তি পাবার সম্ভাবনা যতো বেশি হবে চোরের জন্যে চুরি না করার সিদ্ধান্ত নেয়াটা ততো স্বাভাবিক হবে। এবার মনে করা যাক, ধর্মগ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের 'উপস্থিতি', 'দেখা' ও 'শাস্তি দেয়া'র কথা যে-অর্থে বলা হয়েছে তা পুলিশের উপস্থিতি, দেখা ও শাস্তি দেবার মতোই। ধার্মিক বিশ্বাস করেন ঈশ্বর বলে একজন মহাপরাক্রমশালী সত্তা আছেন যিনি সর্বক্ষণ তাঁর সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছেন এবং যাঁর নির্দেশ অমান্য করে কোনো কাজ করলে তিনি শাস্তি দেবেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি আর পুলিশের উপস্থিতি যদি ধার্মিকের কাছে একই ক্যাটাগরির বিষয় হয়, তবে পুলিশের উপস্থিতি বিষয়ে পূর্বোক্ত চোরের মনে যতটুকু নিশ্চয়তা থাকুক না কেন ঈশ্বরের উপস্থিতি বিষয়ে ধার্মিকের নিশ্চয়তা নিশ্চয়ই শতভাগ। ধার্মিকের সংজ্ঞা থেকেই এটা নিঃসৃত হয় যে, ধার্মিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত।[৫] সেক্ষেত্রে কোন ধার্মিকই কখনো ধর্মবিরোধী কাজ বা পাপকাজে লিপ্ত হবার কথা নয়। কিন্তু ধার্মিকরা সবাই জীবনের কোনো না কোনো পর্যায়ে কম-বেশি পাপকর্ম করেন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ধার্মিক "ঈশ্বর" কথাটি যে-উপায়ে ব্যবহার করেন তা "পুলিশ", "অফিসের বস", "ইট", "কাঠ", "পাথর" এ জাতীয় কোনো কিছুর মতো নয়।

এইমাত্র যে-যুক্তিটি আমরা বর্ণনা করলাম সেটা খণ্ডনের জন্যে কেউ বলতে পারেন- ঈশ্বর দেখছেন ও শাস্তি দেবেন এটা জানা সত্ত্বেও ধার্মিক যে পাপকর্ম করেন এটা তাঁর ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। নগদ লাভের লোভ সংবরণ করতে

৫. এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো বিশ্বাসের সাথে যুক্ত নিশ্চয়তার মাত্রাকে শতভাগ বলার মধ্য দিয়ে এটা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, নিশ্চয়তাটি শতভাগ না হয়ে এর কমও হতে পারতো বা কম হওয়াটা নৈয়ায়িকভাবে সম্ভব (logically possible) ছিল। নিশ্চয়তার এ মাত্রাভেদের সম্ভাবনা কেবল বিবরণমূলক উক্তিসমূহে বিশ্বাসের বেলায় প্রযোজ্য। এখানে আমরা ধার্মিকের ঈশ্বর বিশ্বাসের নিশ্চয়তার মাত্রাকে সংখ্যায় পরিমাপ করার মাধ্যমে ধর্মীয় উক্তিকে বিবরণমূলক গণ্য করলাম। যদিও আমাদের মূল উদ্দেশ্য ধর্মীয় উক্তিকে বিবরণমূলক ধরে নিলে কী গোলমাল সৃষ্টি হয় তা দেখানো।

ধার্মিকের ইচ্ছাশক্তি হয়তো কখনো কখনো ব্যর্থ হয় এবং তার ফলে ধার্মিক পাপ কাজ করে ফেলেন। ঈশ্বরের উপস্থিতি, পাপকর্মটি ঈশ্বর কর্তৃক দেখতে পাওয়া ও শাস্তি দেবার সম্ভাবনা যেখানে শতভাগ সেখানে নগদ লাভের লোভের শিকার হওয়াটাকে স্বাভাবিক বলা যায় না। ফলে ঈশ্বরে বিশ্বাস সত্ত্বেও ধার্মিক কেন পাপকর্ম করেন তা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা দিয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমাদের পূর্বে বর্ণিত যুক্তিগুলোর ভিত্তিতে বরং একটা অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায় এভাবে: ধার্মিক "ঈশ্বর" কথাটি যে উপায়ে ব্যবহার করেন তা সাধারণ বিবরণমূলক উক্তিতে মানুষ যেভাবে "পুলিশ", "অফিসের বস", "ইট", "কাঠ", "পাথর" ইত্যাদি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে থাকে তার থেকে একেবারেই ভিন্ন ক্যাটেগরির।

ধর্ম, ধর্মবাদ, বিজ্ঞানবাদ

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি, ধর্মীয় ভাষাকে বিবরণমূলক গণ্য করার যে প্রভাবশালী চর্চা সমাজে চালু আছে তার সঠিকতা বিষয়ে সন্দেহের জোরালো কারণ রয়েছে। অর্থাৎ ধর্মীয় ভাষাকে বিবরণমূলক মনে না করার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি আছে। একটি সম্ভাব্য আপত্তি আসতে পারে এরকম: ধার্মিক নিজেও কি ধর্মের কথাগুলোকে বিবরণমূলক গণ্য করেন না? কোনো উক্তিকে বিবরণমূলক গণ্য করার লক্ষণ দেখা যায় উক্তিটিকে প্রমাণ করার জন্যে যুক্তি দেয়ার চেষ্টার মধ্যে। সেন্ট একুইনাস, সেন্ট আনসেলমের মতো বিখ্যাত ধার্মিকগণ কি খৃস্টীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নি? আমরা অস্বীকার করছি না যে, কোনো কোনো ধার্মিক কখনো কখনো ধর্মীয় উক্তিকে বিবরণমূলকভাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু একে ধর্মীয় উক্তির একমাত্র তো নয়ই, এমনকি মুখ্য ব্যবহারও বলা যাবে না। আমাদের একটি অনুমান হচ্ছে- সুফিগণ বা রামকৃষ্ণের মতো মরমী (mystic) ধার্মিকদের ধর্মীয় ভাষার ব্যবহার সবচাইতে স্পষ্টভাবে অবিবরণমূলক (non-descriptive)। এছাড়া সাধারণ ধার্মিকদের ধর্মীয় ভাষা মুখ্যত অবিবরণমূলক। এ দুয়ের মাঝখানে আছেন একুইনাস বা অনসেলমের মতো প্রথাগত ধর্মদার্শনিকরা কিংবা ডা. জাকির নায়েকের মতো ধর্মপ্রচারকরা যাঁরা ধর্মীয় উক্তিগুলোকে বিবরণমূলক উক্তির মতো করে বিবেচনা করে সেগুলোর যৌক্তিকতা নিয়ে ভাবতে বা আলোচনা করতে উৎসাহী হন। উল্লেখ্য যে, যাঁরা ধর্মীয় উক্তির যৌক্তিক ভিত্তি খোঁজেন তাঁরা নিজেরা কখনো যুক্তির কারণে ধার্মিক হন কিনা সন্দেহ। এমনকি অবিশ্বাসীরাও

যুক্তির কারণে নাকি অন্য অবিশ্বাসীদের জীবনাচরণে আকৃষ্ট হয়ে অবিশ্বাসী হন সেটা ভেবে দেখার আছে। ডা. জাকির নায়েকের মতো যাঁরা ধর্মীয় ভাষার গুণগত তফাৎ বুঝতে ব্যর্থ হয়ে ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সমস্ত বিজ্ঞান খুঁজে পান তাঁদেরকে বলা যেতে পারে ধর্মবাদী। বার্ট্রান্ড রাসেল বা হুমায়ুন আজাদের মতো ধর্মের সমালোচনকারীরাও ধর্মীয় ভাষার সাথে বিজ্ঞানের ভাষার গুণগত পার্থক্য করেন না এবং ধর্মকে একরকম কুসংস্কার গণ্য করেন। শেষোক্ত যাঁরা বিজ্ঞানকে জীবন ও জগতের সমস্ত রকমের সমস্যা সমাধানের একমাত্র উৎস গণ্য করেন এবং বিজ্ঞানের মানদণ্ডে ধর্মসহ সবকিছুকে মাপতে চান তাঁদেরকে বলা হয়ে থাকে বিজ্ঞানবাদী। ধর্মবাদীর কাছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ধর্মীয় জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বা বিজ্ঞান ধর্মের অঙ্গীভুত। বিজ্ঞানবাদীর কাছে ধর্ম এক রকম কুসংস্কার বা অপবিশ্বাস। অন্যদিকে, যে-ধার্মিক ধর্মবাদের ফাঁদে পড়েন নি তাঁর কাছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই; ধর্ম বিজ্ঞানও নয়, অপবিশ্বাস বা কুসংস্কারও নয়। চিত্রে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়:

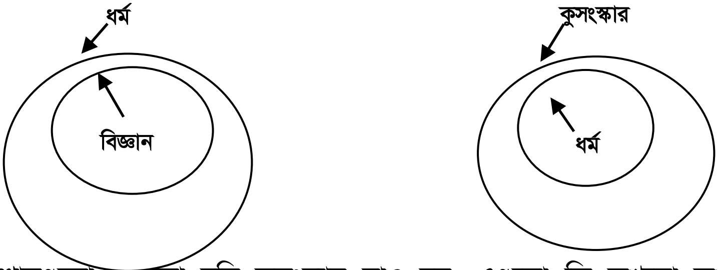

ধর্মবিশ্বাসগুলো নিজেরা যদি কুসংস্কার নাও হয়, এগুলো কি কখনো ধার্মিককে ক্ষ... কাজে প্ররোচিত করে না? কেউ হয়তো সত্যজিত রায়ের “দেবী” ছবির উদাহরণ ... রায় দয়াময়ীকে কালীর অবতার গণ্য করে অসুস্থ ... কিৎসকের শরণাপন্ন না হয়ে শুধুই দয়াময়ীর ক... নির্ভর করেছিলেন। এর ফলে খোকা শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিল ... এ জাতীয় সমস্যার দায় ধর্মের উপর

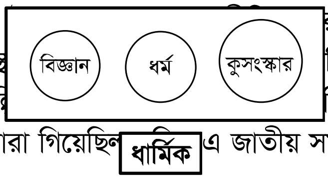

না চাপিয়ে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, কুপমণ্ডুকতা ও ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের উপরই বোধহয় চাপানো উচিত (কালীতে তো অনেকেই বিশ্বাস করেন কিন্তু তাঁদের সবাই নিশ্চয়ই কালীকঙ্কর রায়ের মতো কাজ করেন না)। কেউ কেউ হয়তো ধার্মিক কর্তৃক দেশে ও বিদেশে নিরীহ মানুষ হত্যার ঘটনাগুলোকেও ধর্মবিশ্বাসের কুপ্রভাব হিসেবে দেখাতে চাইবেন। কিন্তু তড়িঘড়ি করে ধর্মের উপর দায় চাপানোর আগে মনে রাখা দরকার- ক্ষমতা বা রাজনীতির খেলায় ধর্মের অপব্যবহার এবং ধার্মিকের ধর্মচর্চা এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য থাকা সম্ভব। ক্ষতিকর প্রযুক্তিতে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অপব্যবহারের জন্যে বিজ্ঞান নিজে যদি দায়ী না হয় তাহলে ধর্মের অপব্যবহারের জন্যে ধর্ম নিজে কেন দায়ী হবে? বুঝবার সুবিধার জন্যে আমরা এখানে ধর্ম ও ধর্মবাদকে পৃথক করলাম কিন্তু মানুষের বাস্তব চর্চায় এরা হয়তো একে অপরের সাথে জড়ানো থাকে; হয়তো একই ব্যক্তির জীবনচর্চায় ধর্ম ও ধর্মবাদের সহাবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব।[৬]

ধর্মবাদীরা যে ধর্মীয় ভাষাকে বিবরণমূলক গণ্য করেন সেটা বোঝা যায় তাঁদের ধর্মকে যুক্তিপূর্ণ করার চেষ্টার মধ্যে। কিন্তু সাধারণ ধার্মিকরাও কি মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করেন না? এমন ঘটা কি খুব অস্বাভাবিক যে, আমরা হঠাৎ কোনো একজন সাধারণ ধার্মিককে প্রশ্ন করে বসলাম "কেন আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?" আর তিনি উত্তর দিলেন "এ সুশৃঙ্খল জগতটা এমনি এমনি বর্তমান অবস্থায় আসতে পারে না। নিশ্চয়ই এর পেছনে একজন স্রষ্টা আছেন।" কিন্তু ধার্মিক যদি ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে এমন যুক্তি দেনও তার মানে কিন্তু এ নয় যে, ওই যুক্তির ভিত্তির উপরেই তিনি তাঁর ধর্মবিশ্বাসকে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁকে ভাবতে বাধ্য করা হলে তিনি ধর্মীয় উক্তিকে বিবরণমূলক গণ্য করতেও পারেন। কিন্তু ধার্মিককে প্রশ্ন না করে বা চিন্তা করতে বাধ্য না করে আমরা যদি তাঁর ধর্মজীবনের দিকে তাকাই এবং তাঁর জীবনে ঈশ্বরের ও ধর্মবিশ্বাসগুলোর স্থান বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে হয়তো ভাষায় বা চিন্তায় তাঁর বিভ্রমকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। কবিকে যদি তাঁর কবিতা বিষয়ে চিন্তা করতে

---

৬. আস্তিক ও নাস্তিকের পার্থক্য যদি দুটি পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসগুচ্ছের পার্থক্য না হয়ে বরং দুই ভিন্ন জীবনরীতির পার্থক্য হয় তবে একই মানুষের মধ্যেও আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের সহউপস্থিতি অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে একজন মানুষ হয় আস্তিক নয়তো নাস্তিক ব্যাপারটি এমন নাও হতে পারে। এমন হতে পারে যে, আস্তিক্য ও নাস্তিক্য হ্যাঁ/না এর ব্যাপার নয়, বরং একটা মাত্রাগত ব্যাপার (matter of degree)।

বাধ্য করা হয়, কবির কাছে যদি তাঁর কবিতার সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা চাওয়া হয় কবি হয়তো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারবেন না বা হয়তো ভুল কিছু বলে ফেলবেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও কবিতা যা তা-ই থাকবে। কাব্যচর্চা ও কাব্য সমালোচনা এক জিনিশ নয়। কাব্য উপভোগের সক্ষমতা ও কাব্য সমালোচনার সক্ষমতাও অভিন্ন নয়। ফলে প্রথমটি যার মধ্যে উপস্থিত তার মধ্যে দ্বিতীয়টি অনুপস্থিত থাকতেই পারে। একই রকম পার্থক্য আছে ভালো খেলতে পারা ও খেলার ব্যাকরণ বুঝতে পারার মধ্যে। সেকারণে বিশ্বমানের খেলোয়াড়দেরও কোচের দরকার হয়, যদিও খেলতে নামলে কোচ নিজে হয়তো খেলোয়াড়দের মতো খেলতে পারবেন না। খেলার মাঠে যে-খেলোয়ার চূড়ান্ত দক্ষতা প্রদর্শন করেন তিনি কারো প্রশ্নের মুখে তাঁর দক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণে সক্ষম নাও হতে পারেন। সাধারণ ধার্মিকও একইভাবে ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ব্যর্থ হতে পারেন।

এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়- বিজ্ঞানবাদী ও ধর্মবাদীরা (এবং কখনো কখনো সাধারণ ধার্মিকও) কেন ধর্মীয় উক্তিগুলোকে বিবরণমূলক গণ্য করার ভুলটি করেন? ধর্মীয় উক্তি যা একে সেরকম হিসেবে দেখতে তারা কেন ব্যর্থ হন? ভিটগেনস্টাইন সম্ভবত এর দুটো কারণ বলবেন। এক. আমাদের ভাষার বিভিন্ন উক্তিসমূহের মধ্যকার বাহ্যিক সাদৃশ্য আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। "ঈশ্বর আছেন" আর "বাঘ আছে" বাক্যদুটোর বাহ্য ব্যাকরণ (surface grammar) অভিন্ন। একই কথা প্রযোজ্য "ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন" আর "রাইট ভ্রাতৃদ্বয় উড়োজাহাজ তৈরি করেন" বাক্য দুটোর ক্ষেত্রে। ভাষার এই বাহ্যিক সাদৃশ্য আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্যে কোন উক্তিকে কারা কোন পরিস্থিতিতে (context) কিভাবে ব্যবহার করছেন সেদিকে নজর দিতে হবে। দুই. বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর সাফল্যে বিভ্রান্ত হয়ে বিজ্ঞানকে তার সীমার বাইরে বিস্তৃত করা, ধর্মকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী প্রবণতা।

ধর্মীয় ভাষার সদর্থক বৈশিষ্ট্য

এ পর্যন্ত আমরা ধর্মীয় ভাষা কী নয় তার আলোচনা করলাম। ধর্মীয় ভাষা যদি বিবরণমূলক না হয় তবে এর প্রকৃত চরিত্র কী? এটি কি কাব্য বা সাহিত্যের ভাষার মতো আবেগমূলক? যে কেউ সহজেই মানবেন যে, কাব্য বা সাহিত্যের ভাষা বিবরণমূলক নয়। কাব্য বা সাহিত্যের কোনো উক্তিকে আমরা সত্য বা মিথ্যা বলি না (আরো সঠিকভাবে বললে, "সত্য" বা "মিথ্যা"-র যে-অর্থে বিবরণমূলক বাক্যসমূহ সত্য বা মিথ্যা হয় সে-অর্থে বলি না); এগুলোর

যৌক্তিকত-অযৌক্তিকতা, প্রমাণ-অপ্রমাণের প্রশ্নও তুলি না। কোনো কাব্য বা সাহিত্যগ্রন্থ থেকে আপাত বিবরণমূলক কোনো উক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে কেউ যদি এর প্রমাণ কিংবা যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার প্রশ্ন তোলেন তা যেমন বিভ্রান্তিকর হবে তেমনি ধর্মীয় উক্তির প্রমাণ বা যৌক্তিকতার প্রশ্নও অবান্তর ও বিভ্রান্তিকর। তার মানে কিন্তু এ নয় যে, ধর্মীয় ভাষা একরকম সাহিত্যিক ভাষা এবং ধর্মগ্রন্থগুলো সাহিত্যগ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্ম ও শিল্পসাহিত্যের সম্পর্কটি পৃথক অনুসন্ধানের বিষয়। মোটদাগে বলা যেতে পারে, ধর্মীয় ভাষা মুখ্যত পরিচালনামূলক (regulative)। এর সাথে শিল্পসাহিত্যের ভাষাকে পৃথক করার জন্যে চাইলে শিল্পসাহিত্যকে আবেগমূলক গণ্য করা যেতে পারে বটে। তবে ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদরেখা টানতে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ কেননা অনেক মহৎ সাহিত্যগ্রন্থই ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় লিখিত[৭] এবং কোরানশরিফসহ অনেক ধর্মগ্রন্থের ভাষায় কাব্যিকতা হয়তো একেবারে অনুপস্থিত নয়। ধর্মীয় ভাষাকে পরিচালনামূলক বলার মধ্য দিয়ে আমরা এটাই বলতে চাইছি যে, ধার্মিকের কথাগুলো ধার্মিকের সমস্ত জীবনযাপনের মধ্যে একরকম গাইডের ভূমিকা পালন করে। তবে এই ভূমিকা কোনো তত্ত্ব, মতবাদ বা নীতি-নিয়মের মতো করে নয়। অন্যভাবে বললে, ধর্মের কথাগুলোকে যদি ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ মনে করি তবে ধর্মবিশ্বাসগুলো হচ্ছে ধার্মিকের ধর্মজীবনের অচ্ছেদ্য অংশ। ধর্মীয় ভাষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ভিটগেনস্টাইনের মন্তব্যসমূহ থেকে উদ্ধার করা যায়। ধর্মীয় ভাষা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় বা এর এক রকম অনন্যতা (uniqueness) আছে। এখানেও সাহিত্যের ভাষার সাথে এর মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ”-র কোনো অনুবাদ কবিতাটির বিকল্প হতে পারে না; এই কবিতাটির উপর হাজারটা কাব্য সমালোচনা লেখা হলেও তার কোনোটিই কবিতাটি যা করে তা করতে পারে না। কাব্যের মতো ধর্মের কথাগুলোও বাক্যান্তরের (paraphrase) ফলে তার কার্যক্ষমতা হারায়। সেকারণেই হয়তো ধার্মিক ঈশ্বরের বিশেষ নামেই তাঁকে ডাকেন, ধর্মের বিশেষ ভাষাতেই প্রার্থনা সম্পন্ন করেন।

---

৭. প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ তো এমনকি এই দাবিও করে ফেলেছেন যে, “প্রতিটি লেখক এক অর্থে ধর্মপ্রচারক” (রাইসু ও শরিফ, ২০১২)। অনেকেই হয়তো একমত হবেন যে, অবিশ্বাসীগণ প্রায়শ শিল্পসাহিত্যানুরাগী হয়ে থাকেন। জিজ্ঞাসা জাগতেই পারে: শিল্পের আড়ালে তাঁরা কি তবে গোপনে ধর্মের সুধাই পান করেন? ধর্মহীন জীবন সহ্য করা মানুষের পক্ষে কি এমনই কঠিন?

ধর্মের সম্ভাবনা

ধর্মীয় ভাষা যদি সত্যিই বিবরণমূলক না হয়ে থাকে তবে তা ধর্মের সমালোচনাকারীদের সমালোচনাকে বিভ্রান্তিকর প্রমাণ করে। কিন্তু এতেই কি ধর্মের উপযোগিতা প্রমাণ হয়ে যায়? ধর্মের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণের জন্যে ব্যবহৃত যুক্তিগুলোর ভিত্তিমূলে ত্রুটি থাকলেই কি প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম প্রয়োজনীয়, মূল্যবান বা শ্রদ্ধেয়? কোনো কিছু অশ্রদ্ধেয় না হলেই কি তা শ্রদ্ধেয় হয়? মানুষের জীবনে ধর্ম কী ধরনের সদর্থক (positive) ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে তা পৃথক অনুসন্ধানের বিষয়। মোটাদাগে বলা যেতে পারে, ধর্ম কতগুলো মতবাদের (doctrines) বা নীতি-নিয়মের সমষ্টি নয় বরং বেঁচে থাকার একটা পন্থা[৮] (way of living), জীবনকে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি। ধরা যাক, একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি নানা আসবাবপত্র আছে এবং কেউ একজন ঘরটাতে একটা শেলফ ঢুকিয়ে দিলেন। আমরা বলতে পারি, ঘরটাতে যে আসবাবপত্রগুলো ছিল তার সাথে নতুন আরেকটি আসবাব যোগ হল। কিন্তু অন্ধকার ঘরটাতে যদি আলো ফেলা হয় তাহলে কি নতুন কোনো আসবাব যোগ হবে বা আসবাবপত্রের সংখ্যার বৃদ্ধি হবে? নিশ্চয়ই নয়। বরং ইতোমধ্যে বিদ্যমান আসবাবগুলো দৃশ্যমান হবে। আলোটা আসবাবগুলোর থেকে ভিন্ন ক্যাটেগরির জিনিস এবং এটা আসবাবগুলোকে একটি বিশেষ উপায়ে দৃশ্যমান করে তোলে (সবুজ আলো সবুজ রঙে কিংবা নীল আলো নীল রঙে আসবাবগুলোকে দৃশ্যমান করে)। একইভাবে, ধার্মিকের ঈশ্বরের ধারণাটিও জগতের নানা জিনিশের (যেমন- ইট, কাঠ, পাথর, পুলিশ, অফিসের বস) সাথে নতুন আরেকটি জিনিশ (thing) যোগ করে না। এই মত কেবল অধার্মিকের জন্যে মান্য তা নয়, ধার্মিকও এটা মানতে আপত্তি করবার কথা নয়। উদাহরণস্বরূপ, কোরানে আল্লাহকে আলো (নুর)-র সাথে তুলনা করা হয়েছে: "আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি" (সুরা নুর: ৩৫)। ইসলাম ধর্মে যে আল্লাহকে অন্য কোনো কিছুর সমকক্ষ করাকে গুরুতর পাপ বা শিরক গণ্য করা হয় তা এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে। ঈশ্বর যদি জগতের কোনো বিশেষ বস্তু না হন তাহলে তিনি কী? এমন হতে পারে ধার্মিককে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করা হলে তিনি আসলে ভাষার সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়ে যান আর তার ফলে

৮. কেউ হয়তো যোগ করতে চাইবেন: ধর্ম মৃত্যুর বিভীষিকাকে মোকাবেলারও পন্থা, যা হয়তো কোনো তত্ত্ব দিয়ে মোকাবেলা সম্ভব নয়।

সৃষ্টি হয় অর্থহীন বুলি। তবু হয়তো ধার্মিককে ভুল বুঝে তার উপর ভুল মত আরোপের যে চর্চা চালু আছে তা থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মনে করা যেতে পারে যে, ঈশ্বর পদটি নতুন কোনো বস্তু/জিনিসকে নির্দেশ করে না; বরং এর মধ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গি (point of view) বা জীবন ও জগতের দিকে তাকানোর একটা পন্থার প্রকাশ রয়েছে। তবে "দৃষ্টিভঙ্গি" শব্দটি দ্বারা কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে না। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ধর্মজীবনকে আমরা বিচ্ছিন্ন মনে করছি না। "ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি"কে "ধর্মীয় জীবনরীতির"ই ভিন্ন প্রকাশ বলা যেতে পারে।

ধর্মের কথাগুলো ধার্মিককে যেন কিছু ছবি (pictures) দেয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বর কর্তৃক জগত সৃষ্টি, শেষ বিচারের দিন এগুলো যেন কিছু ছবি যেগুলো ধার্মিকের চোখের সামনে সবসময় থাকে এবং তাঁর সমস্ত জীবনকে পথ প্রদর্শন করে। ধর্মগুলো যেন "ছবিতে সজ্জিত জীবন যাপনের বিধান[৯] (rules of life dressed up in pictures)" (ভিটগেনস্টাইন, ১৯৯৮, পৃ.৩৪)। ধার্মিকের জীবনে এই ছবিগুলোর স্থান অন্য আর কোনো কিছুর মতো নয়; ধার্মিক এগুলো ধরে রাখেন প্রবল আবেগে। বুদ্ধি নয়, প্রবল আবেগ (passion) ধর্ম কর্তৃক প্রদত্ত ছবিগুলোর সাথে জড়িয়ে থাকে। ধর্মের কথাগুলো যেন কোনো এক বিশেষ জীবন যাপন রীতির প্রতি প্রবল আবেগীয় অঙ্গীকার (passionate committment)। ধর্মের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক ভিত্তির অভাব ও প্রবল আবেগের উপস্থিতি দোষের কিছু নয় কেননা ধর্ম মানুষের যে প্রয়োজন পূরণ করে তা "হৃদয়ের প্রয়োজন", "আত্মার প্রয়োজন"[১০]; বুদ্ধির প্রয়োজন মেটানো ধর্মের কাজ নয়। এই বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্যে একজন সন্তানহারা মায়ের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করা যাক। সদ্য সন্তান হারিয়ে গভীর দুঃখে কাতর একজন মা চীৎকার করে কেঁদে বলছেন: "কেন আমার ছেলেটা মারা গেল?" এ প্রশ্নটা কি বুদ্ধির প্রয়োজন মেটানোর জন্যে করা হয়েছে? মা কি জানতে চাইছেন কোন ধরনের জীবাণু বা রোগের আক্রমণে ঠিক কী ধরনের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সন্তানের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হল? মায়ের

৯. এখানে ভুল বোঝাবোঝি এড়ানোর জন্যে 'বিধান' বা 'নিয়ম' (rule) কথাটার অর্থের ব্যাপারে সতর্ক হবার দরকার আছে। ভিটগেনস্টাইনের দর্শনে 'বিধান'/'নিয়ম' কথাটার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এখানে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, উদ্ধৃতিটির মানে কিন্তু এই *নয়* যে, ধর্ম হচ্ছে "এটা করো, ওটা করো না" জাতীয় কতগুলো নীতি-নিয়ম বা নির্দেশাবলীর সমষ্টি।

১০. "প্রয়োজন" কথাটার মধ্যে হয়তো একটু স্থূলতা আছে। কিন্তু সহজবোধ্যতার জন্যে আপাতত আমরা এই শব্দটিই ব্যবহার করছি।

একজন নিকটাত্মীয় মায়ের প্রশ্নের উত্তরে যদি বাচ্চাটির রোগের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে শুরু করেন তা কি ওই পরিস্থিতিতে হাস্যকর বোকামি হয়ে যাবে না? মায়ের প্রশ্নের মধ্যে যদি তাঁর কোনো প্রয়োজনের বহিঃপ্রকাশ থেকে থাকে তবে সেটা "হৃদয়ের" বা "আত্মার" প্রয়োজন, বুদ্ধির প্রয়োজন নয়। হৃদয়ের এই প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে ওই নিকটাত্মীয় হয়তো মা-কে জড়িয়ে ধরবেন, তার সঙ্গে একটুখানি চোখের পানি ফেলবেন, দু'একটা সান্ত্বনার বাণীও হয়তো অস্ফুটে বলবেন। মা নিজে এরকম অবস্থায় কী করেন? তিনি প্রবলভাবে কাঁদেন, হয়তো সন্তানের পোশাক বুকে জড়িয়ে রাখেন, হয়তো সন্তানের ফটোগ্রাফে চুমু খান। এভাবেই হয়তো তাঁর আত্মার প্রয়োজন মেটে। যে মা মৃত সন্তানের পোশাক বুকে জড়িয়ে বসে থাকেন তিনি কি বিশ্বাস করেন তাঁর মৃত সন্তানটি তাঁর দেয়া এ আদর ও উষ্ণতা অনুভব করতে পারছে? অথবা তিনি যখন সন্তানের ফটোগ্রাফে চুমু খাচ্ছেন তখন কি তিনি চিন্তা করেন যে, এই চুম্বন তাঁর মৃত সন্তানটিকে স্পর্শ করবে? সাধারণভাবে আমরা তা মনে করি না। মা সম্ভবত কোনো ফলাফলের আশায় এসব করেন না। মা তাঁর কোনো বিশেষ প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্য মাথায় রেখেও হয়তো করেন না। কিন্তু সন্তানের পোশাক বুকে জড়িয়ে রাখা কিংবা ফটোগ্রাফে চুম্বনের মতো কর্মকাণ্ডগুলো নিজেরাই হয়তো একটা সন্তুষ্টি দেয়, এগুলো হয়তো মায়ের আত্মার প্রয়োজন পূরণ করে[১১]। অন্যদিকে আমরা কল্পনা করতে পারি, যে-চিকিৎসক সন্তানটির চিকিৎসায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁর অধীনস্থ একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক হয়তো সিনিয়র চিকিৎসককে ওই একই প্রশ্ন করলেন- "কেন বাচ্চাটা মারা গেল?" এক্ষেত্রে প্রশ্নটি করা হয়েছে বুদ্ধির প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। ইন্টার্ন চিকিৎসক তাঁর প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এ প্রশ্ন করেছেন এবং কোন জীবাণু বা রোগ কী ধরনের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাচ্চাটার মৃত্যু ঘটিয়েছে তার খুঁটিনাটি তাঁর জানা দরকার। সিনিয়র চিকিৎসক তাঁকে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন। যে-চিকিৎসাশাস্ত্রীয় চর্চার মধ্যে এই

১১. সন্তানহারা মায়ের বিচ্ছেদবেদনাকে কেউ হয়তো জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষের দুর্ভোগের ইঙ্গিত বলে গণ্য করতে চাইবেন। ধর্মগুলো কি তাহলে জগতের সাথে ব্যক্তিমানুষের সম্বন্ধিত হবার পন্থা? এভাবে বললে ধর্মকে যেন কিছুটা বোঝা যায় আবার যায় না। প্রশ্ন উঠবে: "জগতের সাথে সম্বন্ধিত হওয়া" কথাটার মানে আসলে কী? এখানে ভাষা তার সীমা লঙ্ঘন করছে না তো? সেকারণে ধর্ম *কী নয়* তা বলাই বেশি নিরাপদ বোধ হয়। ধর্ম *কী* তা বলতে গেলেই মনে হয় যেন ভাষাকে তার সীমার বাইরে টেনে নেয়া হচ্ছে।

চিকিৎসকগণ আছেন সেই প্রেক্ষাপটে ছেলেটির মৃত্যুর কারণ বিষয়ক তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনাটি খুবই স্বাভাবিক এবং প্রাসঙ্গিক। তার মানে, আপাতদৃষ্টে সদৃশ দুটি প্রশ্ন বা বাক্য তাৎপর্যের দিক থেকে একেবারে ভিন্ন দুই ক্যাটেগরির হতে পারে। প্রশ্ন বা বাক্যটির তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে আমাদের তাকাতে হবে ঐ প্রশ্ন বা বাক্য যে প্রেক্ষাপটে উচ্চারিত হয়েছে সেদিকে। অর্থাৎ দেখতে হবে কারা, কোন পরিস্থিতে, কোন উদ্দেশ্যে, কোন প্রয়োজনের তাড়নায় প্রশ্নটি বা বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন। ধর্মের যে-সমালোচক ধার্মিককে বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের সাহায্যে ধর্মবিশ্বাসের অসারতা বোঝাতে যান তিনি আমাদের উদাহরণের সেই আত্মীয়টির মতো যিনি সন্তানহারা মায়ের "কেন আমার ছেলেটা মারা গেল?" এ আর্তনাদকে একটি তথ্য-অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন গণ্য করে তার উত্তরে মৃত ছেলেটির রোগের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিতে শুরু করেন।

ধর্ম মানুষের হৃদয়ের প্রয়োজন পূরণ করে বলার অর্থ এ নয় যে, ধর্ম মানুষের অসহায়বোধের উপশম করে মাত্র বা তাকে অসহায়বোধ থেকে পালানোর একটা আশ্রয় দেয়। মানুষের উপর ধর্মের প্রভাব চিকিৎসাশাস্ত্রে যাকে বলে "প্লাসিবো ইফেক্ট" (placebo effect) তার মতো নয়। প্লাসিবো এক রকম মিথ্যা ঔষধ যা দেহের কোনো ক্ষতি করে না। রোগী সত্যিকার ঔষধ মনে করে প্লাসিবো সেবন করে এবং নিতান্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণে এর সুফল ভোগ করে। ধর্মবিশ্বাসগুলো প্লাসিবোর মতো নয়, কারণ, পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, এগুলো "মিথ্যা" নয়। "মিথ্যা" বিধেয়টিকে আমরা যেভাবে বিবরণমূলক উক্তিসমূহের উপর প্রয়োগ করি সেভাবে ধর্মীয় উক্তিসমূহের উপর প্রয়োগ করতে পারি না। ভিটগেনস্টাইন একবার তাঁর প্রিয় ছাত্র ড্রুরি-র কাছে মন্তব্য করেছিলেন- "সব ধর্মই চমৎকার (wonderful), এমনকি সবচাইতে আদিম নৃগোষ্ঠিসমূহের ধর্মগুলোও" (উদ্ধৃত: হয়ট, ২০০৭, পৃ. ৪৩)। তিনি অন্যত্র এও বলেছেন যে, ধর্মবিশ্বাসগুলো চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রের মতো নয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে - ধর্মের সম্ভাবনার উৎস আরো গভীরে। হয়তো সকল মানুষের গভীর মানবীয় (বা আস্তিত্বিক/existential) প্রয়োজনের সাথে ধর্মগুলোর যোগসূত্র আছে। সেইসাথে মানুষে মানুষে ঐক্য গড়ার চাবিও হয়তো ধর্মগুলোর মধ্যে আছে। ধর্মের প্রকৃতি বিষয়ে ব্যাপকতর অনুসন্ধান তাই আমাদের খুব দরকার।

রচনাপঞ্জি

Arrington, R. L. and Addis M. (eds.) (2001). *Wittgenstein and Philosophy of Religion*, London etc: Routledge.

Clack, B. R. (1999). *An Introduction to Wittgenstein's Philosophy of Religion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Grennan, W. (1976). Wittgenstein on religious utterances. *Sophia* 15 (3):13-18.

Hoyt, C. (2007). Wittgenstein and religious dogma. *International Journal for Philosophy of Religion* 61 (1):39 - 49.

Kober, M.(2007). "In the beginning was the deed": Wittgenstein on knowledge and religion, in D. Moyal-Sharrock and W. H. Brenner (eds.), *Readings of Wittgenstein's On Certainty*, pp 225–50. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Moyal-Sharrock, D. (2004). *Understanding Wittgenstein's On Certainty*. Basingstoke etc.: Palgrave Macmillan.

Plant, B. (2004). The Wretchedness of Belief: Wittgenstein on Guilt, Religion, and Recompense. *Journal of Religious Ethics* 32 (3):449 - 476.

Schroeder, S. (2007). The Tightrope Walker. *Ratio* 20 (4):442–463.

Wittgenstein, L. (1967). *Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

-(1969). *On Certainty*. Oxford:Basil Blackwell.

-(1998). *Culture and Value*, revised second edition. Oxford: Blackwell.

-(2009). *Philosophical Investigations*, 4th edition (trans. Anscombe, Hacker and Schulte). Chichester, West Sussex, U.K.; Malden, USA: Wiley-Blackwell

আজাদ, হুমায়ুন। (১৯৯৭)। *আমার অবিশ্বাস*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

রাইসু, ব্রাত্য ও শরিফ, সাজ্জাদ। (২০১২)। হুমায়ুন আহমেদের সাক্ষাতকার। <http://bratyaraisu.com>

রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর (অনুবাদক)। (২০০০)। *কোরানশরিফ: সরল বঙ্গানুবাদ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।